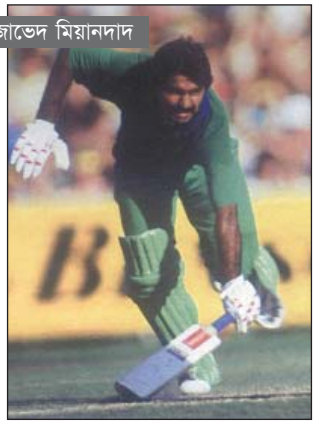
জাভেদ মিয়ানদাদ

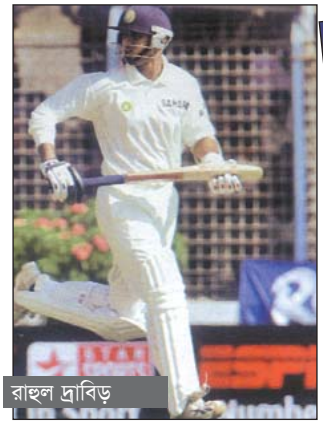
রাহুল দ্রাবিড়

ডীন জোন্স

আসিফ ইকবাল

একের এগারো

লেগ সাইডে আলতো টোকা অথবা অফসাইডে ছোট্ট একটা ঠেলা.... মেরেই পৌঁছে যেতেন ক্রিজের অন্য প্রান্তে। বলে বলে রান নিতে wm×n¯ এগারোজন ব্যাটস্‌ম্যানকে নিয়ে

লিখেছেন **ফজলে রাব্বি রাজীব**

১. ডন ব্রাডম্যান

'ফেন্সি ডুইং দ্যাট', জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে এরিক হোলিসের বলে বোল্ড হয়ে যখন শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরছিলেন স্যার ডন ব্রাডম্যান এই উক্তিটি করেছিলেন। ১৯২৯ সালের এডিলেড টেস্টে জ্যাক হবস্‌ের হাতে রানআউট হওয়ার পর সেই একই উক্তি করেছিলেন তিনি টেস্ট কেরিয়ারে ওই একবারই রানআউট হয়েছিলেন। একজন অসম্ভব মারমুখী ব্যাটস্‌ম্যান হয়েও সিঙ্গেলস্‌ের গুরুত্ব সম্পর্কে সব সময় সচেতন ছিলেন। ব্রাডম্যান বিশ্বাস করতেন সিঙ্গেলস্‌ এবং বাউন্ডারি একটি অপরটির পরিপূরক। তিনি 'দ্য আর্ট অব ক্রিকেট' বইতে উল্লেখ করেছিলেন, 'শর্ট রান ফিল্ডারদের ৩০ গজের ভেতরে নিয়ে আসে, যা ব্যাটস্‌ম্যানদের জন্য বড় স্ট্রোক খেলার সুযোগ করে দেয়'। ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে তিনি কতটা বড় মাপের ছিলেন এই উক্তি থেকে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যারা ব্রাডম্যানের খেলা দেখেছেন, রানিং বিটউইন দ্য উইকেটে তার ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত আছেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে তার রান আউটের সংখ্যা মাত্র ৪টি।

২. বব সিম্পসন

সিম্পসনের সঙ্গে বাঁহাতি বিল লরি- ইতিহাসের অন্যতম সেরা উদ্বোধনী জুটি। ক্রিকেটে 'পার্টনারশিপে'র সংজ্ঞাকে তারা নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। দ্রুত সিঙ্গেলস্‌ নিয়ে বারবার স্ট্রাইক পরিবর্তন করে ফিল্ডিং সাইডকে রাখতেন চাপের মধ্যে। একবার স্ট্রাইক বদল করা মানেই ছিল প্রতিপক্ষ দলের অধিনায়কের জন্য নতুন করে ফিল্ডিং সাজানো। আর বোলাররাও ঘনঘন বলের লাইন পরিবর্তন করতে গিয়ে ছন্দ হারিয়ে ফেলতেন। ক্রিকেটে সিঙ্গেলসের তাৎপর্য বোধহয় সিম্পসনের চেয়ে বেশি কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি। আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সিম্পসনকে অস্ট্রেলিয়ার কোচ নিয়োগ করা হয়। দলের দায়িত্ব নিয়েই তিনি খেলোয়াড়দের মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন যে, একদিনের ম্যাচে যে দল বেশি সিঙ্গেলস্‌ নিয়ে খেলে, ৮৫ ভাগ সময় তারাই জয়লাভ করে। তার এই কিংবদন্তি মতবাদকে পুঁজি করেই ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপ জয়ী অস্ট্রেলিয়া দল দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করে।

৩. ডীন জোন্স

আশির মাঝামাঝি থেকে নব্বইয়ের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জোন্স অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং অর্ডারের তিন নাম্বার পজিশনটি আগলে রেখেছিলেন যত্নের সঙ্গে। গতিময় জোন্স একদিনের ম্যাচের ব্যাটিং ধারায় এনেছিলেন নতুন মাত্রা। তিনি বিশ্বাস করতেন, দ্রুত সিঙ্গেলস্‌ নিতে পারার ক্ষমতা একজন ব্যাটস্‌ম্যানের জন্য কৌশলের মতই ¸i"ZcY। বলে বলে রান করা বরাবরই অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং ধারার মূলমন্ত্র ছিল। ওয়ানডে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর গুরুত্ব বেড়ে যায় আরো বেশি। আর এই গুরুত্বকে উপলব্ধি করে সীমিত ওভারের ম্যাচে ব্যাটিং কৌশলে নতুন রূপদানের ক্ষেত্রে জোন্স অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নিচ্ছিদ্র ফিল্ডিংয়ের ফাঁক গলে বলকে বের করে নিতে পারতেন সহজেই। আবার আস্তে করে বলকে ঠুকে দিয়েই বিদ্যুৎ গতির জোন্স পৌঁছে যেতেন ক্রিজের অন্যপ্রান্তে। আর অধিকাংশ সময়ই প্রতিপক্ষের ফিল্ডারদের জন্য দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখা ছাড়া আর কিছুই করার থাকতো না।

৪. মাইকেল বেভান

অন্য ব্যাটস্‌ম্যানরা যখন বলকে সীমানা পার করার প্রতিযোগিতায় নামতেন সে রকম মুহূর্তেও বেভান সন্তুষ্ট থাকতেন এক রান নিয়ে। বেভানের থিওরি ছিল- মানুষ যা কল্পনা করে, কাজ করা উচিত তার চেয়ে কম প্রাপ্তির আশা নিয়ে। ওয়ানডে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা ফিনিশার বেভান আসকিং রেট নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তার মতে, 'দু-এক ওভার আসকিং রেটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রান তুলতে না পারলেও সেটা পরে পুষিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু একটা উইকেটের পতনে ম্যাচের হিসাব-নিকাশ পাল্টে যেতে পারে চোখের পলকে।' বেভানের ব্যাটিং বৈশিষ্ট্য ছিল বলে বলে রান করা। আস্তে করে বলকে এদিকে ওদিকে ঠেলে দিয়েই এক রান, তবু টার্গেট থাকত আয়ত্তের মধ্যেই। আর এভাবেই তিনি দলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন বারবার।

৫. বিজয় মাঞ্জ্রেকার

যে কোনো বলে গ্যাপ বের করে নেয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল মাঞ্জ্রেকারের। উইকেটের মাঝে দৌড়াতেও পারতেন বিদ্যুৎ গতিতে। প্রত্যেকটা বলে নিজের ইচ্ছামতো শক্তি প্রয়োগ করে স্ট্রোক করতে পারতেন। এর ফলে বল সরাসরি ফিল্ডারের হাতে গেলেও রান নেয়া থেকে তাকে আটকে রাখা যেত না। ভালো পিচে কড়া ফিল্ডিং প্রতিরোধের মাঝে মাঞ্জ্রেকার এই

কৌশলটাকে ব্যবহার করতেন দক্ষতার সঙ্গে। ওভারের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ বলে এক রান নিয়ে স্ট্রাইক ধরে রাখতেন। ব্যাটিংয়ে প্লেসমেন্টের গুণটা আয়ত্ত করেছিলেন টেড ডেক্সটারের কাছ থেকে। তবে মিডল অর্ডারে মাঞ্জেকারের অধিকাংশ সময়ের ব্যাটিং সঙ্গী পলি উম্রিগার তার এই ব্যাটিং চরিত্রকে সমালোচনা করে বলেছেন, 'স্ট্রাইক ধরে রাখার ফলে অন্য ব্যাটস্ম্যানরা ব্যাটিং করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো'।

৬. আসিফ ইকবাল

ব্রাডম্যান তার 'দ্য আর্ট অব ক্রিকেট' বইতে বলেছিলেন, 'বলে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় ব্যাটস্ম্যান দৌড়ানো আরম্ভ করলে তাদের পক্ষে যেমন অসাধ্য সাধন করা সম্ভব, তেমনি প্রতিপক্ষের ফিল্ডারদের জন্যও তাদেরকে রানআউট করা কঠিন হয়ে পড়ে।' ১৯৭৮ সালের করাচি টেস্টে ইকবাল এবং মিয়াঁদাঁদ ব্রাডম্যানের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করলেন ২২ গজের ক্রিজে। ম্যাচের শেষ সেশন। পাকিস্তান তখনো

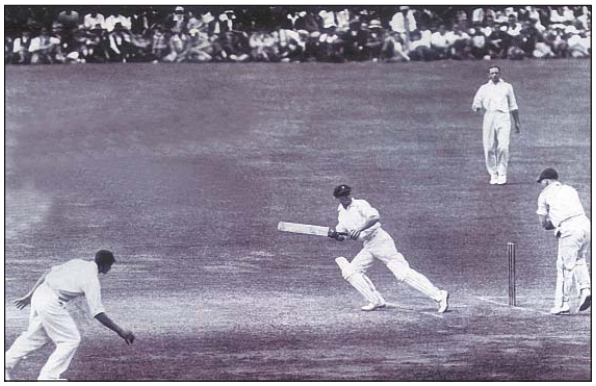

চার আর ছক্কার পাশাপাশি সিঙ্গেলস্ নিতেও ব্রাডম্যান ছিলেন পারদর্শী

জয় থেকে ১৬৮ রান দূরে। শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে ইকবাল এবং জাভেদ মিয়াঁদাদ জুটির অসামান্য তৎপরতায় চিরশত্রু ভারতকে বধ করে পাকিস্তান এক স্মরণীয় জয় ছিনিয়ে আনে। নিজের সময়ে ইকবাল ছিলেন ৬ নাম্বার পজিশনের সবচেয়ে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাটস্ম্যান। রানিং বিটউইন দ্য উইকেটেও তিনি ছিলেন বিশ্বসেরা। ধারণা করা হতো, ৩৫ বছর বয়সেও তিনি তার ২১ বছর বয়সী পার্টনারের সঙ্গে সমান তালে দৌড়াতে পারতেন।

৭. জাভেদ মিয়াঁদাদ

বলে বলে রান নিয়ে প্রতিপক্ষ দলকে কতটা চাপের মধ্যে রাখা যায় তা মিয়াঁদাদের খেলা দেখলে উপলব্ধি করা যায়। ক্রিজে তিনি তখনই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন যখন সিঙ্গেলস্ নিয়ে ফিল্ডিং দলকে এলোমেলো করে দিতে পারতেন। যতক্ষণ ক্রিজে থাকতেন, ফিল্ডারদের সঙ্গে গল্প করে খেলায় তাদের মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতেন। আর একেকটা ডেলিভারির পর ব্যঙ্গ করে বোলারকে রাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন। এক এক করে রান নিয়ে বিপক্ষ দলের সুন্দর পরিকল্পনাকেও ধ্বংস করে দিতে পারতেন। মিয়াঁদাদের ক্রিকেট কেরিয়ারের শুরুটা ছিল ১৯৭৫ সালের বিশ্বকাপ দিয়ে। আর এই বর্ণাঢ্য ক্রিকেট জীবনের ইতি ঘটে ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে। এই দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারের পুরোটা সময় মিয়াঁদাদ তার প্রখর ক্রিকেট মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়েছেন মাঠে উপস্থিত ১১ জন ফিল্ডারকে বোকা বানিয়ে সিঙ্গেলস্ বের করে আনতে।

৮. মোহাম্মদ আজহারউদ্দীন

ওয়ানডে ক্রিকেট যখন নিয়মিত রূপ লাভ করলো, ইনিংসের মধ্যবর্তী ওভারগুলো পরিচিতি পেলো এক এক করে রান নিয়ে সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ করার সময় হিসেবে। ব্যাটিং সাইডের চেষ্টা থাকে যতটা সম্ভব বেশি রান তুলে নেয়া, অন্যদিকে ফিল্ডিং দল নিজেদের সামর্থ্যকে উজাড় করে দেয় এক ওভারে কমপক্ষে দুটো ডট বল বের করে আনতে। ইনিংসের মধ্যবর্তী ওভারগুলোতে রান সংগ্রহের ধারায় আজহার যোগ করেন নতুন মাত্রা। কেরিয়ার শেষে ওয়ানডেতে তার হাফ সেঞ্চুরির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮তে। সিঙ্গেলস্ নিয়ে খেললেও আজহারের ব্যাটিং ছিল উপভোগ্য। অফ স্ট্যাম্পের ওপর আসা একই ধরনের তিনটি বলকে খেলতে পারতেন তিনভাবে। লং অফ দিয়ে চমৎকার ড্রাইভ। চতুরতার সঙ্গে থার্ড ম্যান দিয়ে কাট, আবার কখনো কখনো ডিপ স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে ফ্লিক- স্কোর বোর্ডে আহামরি কোনো পরিবর্তন না হলেও দর্শকরা মুগ্ধ হতেন আজহারের ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখে। খুব কম বোলারই তাকে সিঙ্গেলস্ নেয়া থেকে বিরত রাখতে পারতেন।

৯. অর্জুনা রানাতুঙ্গা

আশি এবং নব্বইয়ের দশকে এশিয়ার সেরা তিনজন মিডল অর্ডার ব্যাটস্ম্যানের একজন রানাতুঙ্গার ব্যাটিং বৈশিষ্ট্য আজহার থেকে ভিন্ন হলেও মিয়াঁদাদের কাছাকাছি ছিল। স্কয়ার লেগের পেছন দিয়ে সুইপ শট রানাতুঙ্গার ব্যাটিং চরিত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক। আর এটা করতে গিয়ে তিনি কখনোই বলের লাইনকে তোয়াক্কা করতেন না। অধিকাংশ সময় তার সামনের পা থাকতো অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে। এটা তাকে এলবিডব্লিউ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতো। মাঝেমধ্যে বলে ব্যাট লাগাতে ব্যর্থ হলেও প্যাডে লেগে রান হয়ে যেত। শারীরিক গঠন মেদবহুল হলেও স্ট্যামিনা ছিল প্রচুর। যেটা বিপক্ষ দলের জন্য ছিল সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনার কারণ। রানিং বিটউইন দ্য উইকেটে ছিলেন খুবই ভালো। যদিও দুই হাতে ব্যাট ধরে গড়িমসি করে রান নিতেই বেশি পছন্দ করতেন। তার রান নেয়া দেখে মনে হতো যেন কোনো শান্ত নিবিড় প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

১০. জাস্টিন ল্যাঙ্গার

চটজলদি রান নিয়ে দীর্ঘদিনের ওপেনিং পার্টনার মাথিউ হেইডেনকে স্ট্রাইক ছেড়ে দেয়ার কাজে ল্যাঙ্গার সিদ্ধহস্ত। দীর্ঘকায় হেইডেন বড় বড় পা ফেলে মাত্র পাঁচ-ছয়টা স্টেপেই পৌঁছে যান ক্রিজের অপর প্রান্তে। বিশালদেহী সঙ্গীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোটখাটো ল্যাঙ্গার যে দ্রুততার সঙ্গে রান নেন এক কথায় তা অসাধারণ। সমকালীন ব্যাটস্ম্যানদের মধ্যে ক্রিজে ল্যাঙ্গারের মতো পরিশ্রমী আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড় ইনিংস খেলার জন্য যে স্ট্যামিনার প্রয়োজন পড়ে সেটা অর্জনের জন্য একটা টেস্টে খেলতে নামার পূর্বে ল্যাঙ্গার নেটে ক্রিজের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ১০০ বার দৌড়ান। এটা কতটা কার্যকর তার প্রমাণ মেলে গত বছর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পার্থ টেস্টে। স্ট্রাইকিং এন্ডে ব্যাটিংরত জেসন গিলেসপিকে শোয়েবের পেস থেকে রক্ষা করার জন্য বল ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাঙ্গার এগিয়ে যান। শোয়েবের করা বাউন্সারটি গিলেসপি কোন মতে এড়িয়ে যান। উইকেট কিপার বল হাতে পেয়ে কিছু করার পূর্বেই ল্যাঙ্গার পৌঁছে যান স্ট্রাইকিং এন্ডে।

১১. রাহুল দ্রাবিড়

কেরিয়ারের প্রথমভাগে টেকনিক্যালি অসম্ভব প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও সিঙ্গেলস্ বের করতে দ্রাবিড়কে প্রচুর ঘাম ঝরাতে হতো। এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার পর দ্রাবিড় নিজেকে মহান ব্যাটস্ম্যানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। শুরুর দিকে দ্রাবিড় এতটাই শুদ্ধ ক্রিকেট খেলতেন যে মাঝে মধ্যে ইনিংসের একটা দীর্ঘ সময় ভালো বোলিংয়ের বিরুদ্ধে রান খরায় ভুগতেন। এ কারণে ওয়ানডে টিম থেকে তাকে বাদ পর্যন্ত দেয়া হয়। এরপর দ্রাবিড় নিজেকে ওয়ানডে ক্রিকেটে ৫ নাম্বার পজিশনের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটস্ম্যান হিসেবে গড়ে তোলেন। যে কোনো বলকে এখন খেলতে পারেন নিজের ইচ্ছে মতো। টেস্টেও তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিণত। এক সময় টেস্টে রানের খাতা খুলতে সময় নিতেন ২০-২৫ মিনিট। এ সমস্যাটাও কাটিয়ে উঠেছেন। চোখ বাঁধানো ড্রাইভ আর ফ্লিকের পাশাপাশি বলকে ফাঁকা জায়গায় ঠেলে দিয়ে রান তুলে নিতে দ্রাবিড় এখন অভ্যস্ত। একজন ভালো ব্যাটস্ম্যানের যতগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন সবগুলোই পাওয়া যাবে তার মধ্যে।